রহু চণ্ডালের হাড়

(১৯৯২-এর বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত)

অভিজিৎ সেন

রহু চণ্ডালের হাড়
অভিজিৎ সেন

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৪০০ টাকা

RAHU CHANDALER HAR A Novel by Abhijit Sen Published by Kobi Prokashani
85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2019
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94102-0-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

বাবা ও মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

রহুচণ্ডালের হাড় আমার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। ১৯৮০ সালে এই উপন্যাস আমি লিখে শেষ করেছিলাম আর পাঁচ বছর পরে ১৯৮৫-তে বইটি কলকাতার *সুবর্ণরেখা* থেকে প্রকাশিত হয়। কী কারণে কোনো বই কিংবদন্তির খ্যাতি অর্জন করে, সেটা দু-এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। বেশি কথাতেও যে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝানো যাবে এমনও মনে হয় না। কিন্তু আমার প্রথম প্রকাশিত বইটির ভাগ্যে যে এই খ্যাতি জুটেছে, সে কথা আমার নিন্দুকেরাও স্বীকার করবেন।

ইদানিং লেখকের পক্ষে আর জানা সম্ভব হয় না যে কত কপি বই তার বিক্রি হয়েছে। তবে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে যে অন্তত দশটি সংস্করণ হয়েছে *রহুচণ্ডালের হাড়*-এর। তাতে মোট কত কপি বিক্রি হয়েছে সে খবর আমার কাছেও নেই। তবে সংস্করণ হলেই যে বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই সেটা লেখক জানে।

যাই হোক, দশটি সংস্করণের মধ্যে একটি বাংলাদেশের নান্দনিক প্রকাশনী থেকেও প্রকাশিত হয়। নান্দনিকের সম্ভবত এখন আর অস্তিত্ব নেই। বইখানিও আর বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে *রহুচণ্ডালের হাড়* পাঠ্য হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। ফলে এই উপন্যাস বিষয়ে একটা একাডেমিক অনুসন্ধিৎসাও পাঠক মহলে সৃষ্টি হয়েছে।

কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সজল আহমেদ বাংলাদেশের জন্য একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলে আমি তাঁকে সানন্দে স্বীকৃতি দিয়েছি।

আশা করি তাঁর প্রকাশিত এই সংস্করণটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে পাঠকের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

১

শারিবার যখন বছর বারো বয়স, তখন নানি লুবিনির সঙ্গে তার সখ্য গভীরতর হয়। কেননা তখন শারিবা সব বুঝতে শিখেছে, নিজের এবং নিজের লোকজনের চতুষ্পার্শ্ব দেখতে শিখেছে। আর সেই সঙ্গে নানির কাছে শুনে শুনে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র রচনা করার চেষ্টাও সে করতে পারে তার অপুষ্ট বুদ্ধিতে।

এইভাবে শারিবা বড় হয়। নিচু দাওয়া, তালপাতার বেড়া দেওয়া ঘর, সরকারি ফরেস্ট থেকে চুরি করে আনা শনের চালা। সেই নিচু গুহার মতো ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার পর স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘন তরলতায় জমে থাকে। লুবিনি তখন কাঁপা কাঁপা গলায় প্রাচীন কথা বলে।

লুবিনি বলে এক অজ্ঞাত দেশের কথা। সি দ্যাশ হামি নিজেই দেখি নাই, তোক্ আর কি কমো। সি দ্যাশের ভাষা বাজিকর নিজেই বিসোরণ হোই গিছে, তোক্ আর কি শিখামো!

সে এক অপরিচিত দেশ। যেখানে ঘর্ঘরা নামে এক পবিত্র নদী বয়ে যায়। সেখানে নাকি কবে এক শনিবারের ভূমিকম্পে সব ধূলিসাৎ হয়েছিল। ঘর্ঘরার বিশাল এক তীরভূমি ভূ-ত্বকে বসে গিয়ে নদীগর্ভের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর তাতে মিশে গিয়েছিল গোরখপুরের বাজিকরদের জীর্ণ বাড়ি-ঘর। ধ্বংস হয়েছিল বাজিকরদের প্রধান অবলম্বন অসংখ্য জানোয়ার।

সে এক কালো অন্ধকারের শনিবার, যা লুবিনি নিজে দেখেনি, যা সে তার নানাশ্বশুরের কাছে থেকে শুনেছে। তারপর যাযাবর বাজিকরের দল ঘর্ঘরার উত্তর তীরে আরো উত্তরে সরে গিয়ে নতুন বসতি তৈরি করে। নতুন করে ভাল্লুক বাঁদর সংগ্রহ করে, দূরবর্তী গ্রাম-শহরে গিয়ে গেরস্থ বাড়ি থেকে 'ভঁইস' চুরি করে আনে। আবার বছরের আট মাস দশ মাস দুনিয়া ঘুরে বেড়াবার নেশায় বেরিয়ে পড়ে তারা। তখন গলা লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে মোষের সারি চলত রাস্তা দিয়ে, গ্রাম-শহরের ভেতর দিয়ে। সেই মোষের পিঠে থাকত বাচ্চারা আর বুড়ো-বুড়িরা। আর থাকত মাল। কোথাও গিয়ে তারা থামত। নদীর পাড়ে, শহরের বাইরের মাঠে, গ্রামের প্রাচীন বটের তলায়। ডুগডুগ করে ঢোলকে কাঠি পড়ত। জনপদের কুকুরগুলো তেড়ে আসত। বাজিকরদের কুকুরগুলো উত্তেজনায় শিকল ছিঁড়ে ফেলতে চাইত। চৌকিদার এসে সর্দারকে থানায় ডেকে নিয়ে যেত।

জি হুজুর, আমরা বাউদিয়া-বাজিকর বটি। জি মালিক, হামার নাম পীতেম

বাজিকর। দলে পাঁচকুড়ি পাঁচজনা আদমি আছে। উস্‌মে শোচ লিজিয়ে দেড়কুড়ি মরদ, দেড়কুড়ি আওরৎ, আর বাকি সব চেংড়া-বাচ্চা।

থানাঘরের বউ-বিবি-বাচ্চারা ভিড় করত। অসীম কৌতূহল সবার চোখে। কি খেলা আছে তোমাদের?

বান্দর আছে, ভাল্লু আছে, দড়ির খেলা আছে, ভান্‌মতি আছে, বহুত কিসিমের খেলা আছে।

সাপ নেই, সাপ?

নেহি মালকিন, বাজিকর সাপ ধরা জানে না।

দশ-পাঁচ টাকা থানাবাবুকে জল খেতে দিতে হয়। তারপরে ছাড়পত্র মেলে। ঠিক আছে, থাকো, কিন্তু কোনো নালিশ যেন না আসে।

নেহি জি, নালিশ কেন আসবে? হামার দলের কোনো বদনাম নেই, হুজুর। সেলাম মালিক, বান্দার নাম পীতেম বাজিকর। কোই দরকার লাগলে চৌকিদারকে ভেজে দেবেন।

কেমকা বুলি ক-ছেন তুই নানি, বুঝা পারি না। ওলা কি হামরাদের আগ্‌লা দ্যাশের বুলি?

না রে শারিবা। এলা বুলি বাজিকর দ্যাশ দ্যাশ ঘুর‍্যে শিখা লয়। যেথায় ঘুরে সিখাকার বুলি ধর‍্যে লয়, সিখাকার ধরমকরম শিখ্যে লয়। সিটা তার আপন বুলিতে মিশাল কর‍্যে লয়। বাজিকরের আপন কুনো ধরম নাই। করম এ্যাটা আছে বটে, তো সিটা হোল ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম। মুলুক মুলুক ঘুর‍্যে বান্দর লাচানো, ভাল্লু লাচানো, পিচ্‌লু-বুঢ়া পিচ্‌লু-বুঢ়ির কাঠের পুতলা লাচানো, ভান্‌মতির খেলা, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, নররাক্ষস হয়া কাঁচা হাঁস, কাঁচা মুরগা কড়মড় কর‍্যে খাওয়া, নাচনা গাহানা– এলা সব বাজিকরের কাম। এলা সব ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম।

ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম!

হাঁ, ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম।

যাঃ।

শারিবার বিশ্বাস হয় না। অথবা, ভিখ্‌-মাঙ্গা কথাটা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার, সেটা ভিখ্‌-মাঙ্গা হবে কেন?

হাঁ, হামরা বলি ভিখ্‌-মাঙ্গা। তোর নানা বলত ভিখ্‌-মাঙ্গা। কাম হইল খেতির কাম, কলের কাম, কামার, কুমার, চাষি, মজদুরের কাম। হামরা তো ওলা কাম কদাপি করি নাই। হামরা তো ওলা কাম জানি না।

তুই খেলা দেখাতিস, নানি?

দেখাতাম তো। পিচ্‌লু-বুঢ়া পিচ্‌লু-বুঢ়ির পুতলা তুই দেখিস নাই, শারিবা? হাতের উপর গামছা ঢাকা দিয়া সি পুতলা লাচাতাম। কাঠের ময়ূর লাচাতাম।

আর বাঁশবাজি, দড়িবাজি?

হাঁ, সিগ্‌লাও করতাম। বিশ হাত উঁচা বাঁশের মাথাৎ সিধা দাঁড়ায়া ছুঁচে সূতা পরাতাম। দুইধারে ভঁইসের সিং-এ দড়ি বাইন্ধে বাঁশ দিয়া ঠেল্যে সি দড়ি টনটনা হত। ভুঁই থিকা বিশ হাত উঁচাতে বাঁশ হাতে হাঁটাচলা, লাচ দেখানো– সি ভোয়ানক কঠিন খেলা রে, শারিবা!

শারিবা মনশ্চক্ষে নানির দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া দেখে, দোল দেয়া দেখে, তারপরেই তার চমক ভাঙে।

ভুঁয়ে হাঁটবা পারিস না তুই, দড়িতে হাঁটতি কেম্‌কা!

কল্পনায় সে এই লোলচর্ম কানিপরা নানিকেই দড়ির উপরে হাঁটতে দেখে, তাতেই চমক খায়। অথচ অবিশ্বাসও করতে পারে না। নানিকে তার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

নানি ফোকলা দাঁতে প্রচুর হাসে।

হায় বাপু, নানি তোর এংকা বুঢ়াই আছিল্ নাকি চেরদিন। বাজিকরের বেটা, শারিবা, এংকা বেহোঁশই হয়। তোর দোষ নাই।

শারিবা লজ্জা পায়। দেওয়ালে, নিচু চালায় ছায়া কাঁপে। লম্ফের আলো থেকে ধোঁয়া হয় বেশি। নানির শীর্ণ কুৎসিত অবয়ব দেয়ালে ভয়াবহ দেখায়, প্রেতিনীর মতো। বুড়ো কুকুরটা গুঁড়ি মেরে পায়ের কাছে শুয়ে আছে। বুড়ির কুকুর গোকো। গোকোর বয়স বুঝি শারিবার মতোই। দীর্ঘ দেহ আর ঝোলানো কান নিয়ে গোকো অতীতকে ধরে আছে। নানি গোকোর মাথায় হাত রাখে। 'গোকো বুঢ়াটা হোই গিলি, গোকো!' গোকো হাই তোলে ও গুরগুর করে আদর উপভোগের স্বীকৃতি জানায়।

তারপর রাত বাড়ত। পাঁচবিবি গ্রামের বাইরে নদীর ধারে কুঁড়েঘরগুলোয় হঠাৎ দমকা হাওয়া লাগত। গোকোর কান খাড়া হতো। শারিবা নানির কোলের আরো কাছে ঘন হয়ে আসত। বাজিকর বোকা বটে। আশপাশের হিন্দু-মুসলমান সবার কাছে বাজিকর বোকা, বাজিকর বজ্জাত। ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে শারিবা এসব চিন্তা করত বারো বছর বয়সে।

তারপর নদীর পাড়ে দুই কুঠিবাড়ির কোনো একটার হাতি নামত জল খেতে। দুই জমিদারের কুঠি ছিল পাঁচবিবিতে। লালকুঠির হাতিটা ছিল মাকনা আর চৌধুরীকুঠির হাতিটা দাঁতাল। দুই হাতি একসঙ্গে যদি কোনোদিন এসে পড়ত, তাহলেই সর্বনাশ হতো।

মরণবাঁচন লড়াই লাগত মাকনা আর দাঁতালে। আশপাশের গাছপালা ভাঙত। বাড়িঘর ভাঙত। মানুষ মরত। গ্রামের মানুষ মশাল জ্বেলে, টিন বাজিয়ে হাতিকে ভয় দেখাত। এপারের মানুষ, ওপারের মানুষ সবাই সন্ত্রস্ত এবং সজাগ থাকত! ভীষণ চিৎকার উঠত। গোকোকে তখন বেঁধে রাখতে হতো।

গোকো সেভাবেই মারা যায় হাতির পায়ের নিচে পড়ে। কেননা সবাই তখন পালিয়েছিল। দুটো মত্ত হাতি কোনো বাধাই মানছিল না। গোকো বাঁধা ছিল, ত্রাসে

সে খেয়াল কারোই ছিল না, নানিরও না। হাতি ঘর ভাঙছে, শনের ঘর, তালপাতার বেড়া, বাঁশের খুঁটি। গোকো মারা পড়ে।

এভাবে তিনবার ঘর ভাঙার স্মৃতি শারিবার সারাজীবন থাকে। কেননা, তার নানা জামির বাজিকর স্থিতিবান হতে চেয়েছিল। জামিরের পিতামহ পীতেম পুবের এই দেশটাকে বোধহয় ভালোবেসেই ফেলেছিল। সে তার দলবল নিয়ে শেষবারের মতো গোরখপুর ত্যাগ করার পর এদিকেই এসেছিল।

পীতেমের আগেও বাজিকরেরা এদেশে আসত, কিন্তু সে করতে চাইল চিরস্থায়ী গৃহস্থী। পীতেমের পরে বালি, তারপর জামির দলের সর্দারি পায়। জামিরের বাপ ধন্দু অল্প বয়সে খুন হয়। কাজেই লুবিনির স্মৃতিতে সে উজ্জ্বল নয়। বাজিকর এমন অঢেল জমি, ধান এবং জল তার পরিচিত ভূমণ্ডলে কোথাও দেখেনি, যদি বাজিকরের পরিচিত ভূমণ্ডল খুব ছোট ছিল না।

কিন্তু সেই ভূমণ্ডলে শস্যদানার বড় অভাব। বিশেষত বাজিকরের। সারা দিনমান জন্তু-জানোয়ার নাচাও, দড়িবাজি, বাঁশবাজি কর, সন্ধ্যায় সেই ভিখ্‌মেঙ্গে পাওয়া ('হাঁ, শারিবা, ভিখ-মাঙ্গা') শস্যদানা ছাইপাঁশ সব মিলিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে ফুটিয়ে নেও। এই হলো বাজিকরের খাওয়া। এসব নানির বলবার দরকার ছিল না, এসব শারিবা তখন নিজেই বুঝতে শিখেছে।

আর এজন্যই এর কিছুদিন পরেই শারিবা বুঝতে পারবে বাজিকর বাউদিয়ার স্বর্গে কেন এত অঢেল খাবার বন্দোবস্ত। নানি বলত, স্বর্গ শারিবা, সি এক আশ্চার্য জায়গা!

শারিবা বলবে, স্বর্গ কুনঠি?

নানি বলবে, সিটা তো জানা নাই, বাপ। জানা থাকলি তো কবিই চলি যাতাম। মরার পরে সেটি যাওয়া যায়।

তখন শারিবা একটা কথা বলবে, যা কোনোদিন আর কোনো বাজিকর বাউদিয়া বলেনি।

শারিবা বলবে, তবি হামার ওঠি যাবার দরকার নাই, নানি। মরার পর হামার অঢেল খাবার খায়্যে কি হোবে?

এসব কথা অনেক পরের। তখনো গোকো মরেনি। তখনো চৌধুরী সাহেব "তুমরা হিঁদু না মোছলমান" এ প্রশ্ন তোলেনি। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হয়নি। তখনো লালকুঠির ম্যানেজার মহিমবাবু "হাঁই বাপু, তোরা গরুও খাস, শুয়ারও খাস, ই কেম্‌কা জাত রে বাপো!" বলে আঁতকে ওঠেনি।

২

শনিবারের ভূমিকম্পের পর ঘর্ঘরার উত্তর তীরে সরে গিয়ে পীতেম আবার তার দলবল নিয়ে ডেরা তোলে। সে গ্রামটা ছিল গোয়ালাদের। তারা এসে বলে, বাজিকর, হেথায় থাকা চলবে না। তাদের হাতে মোটাসোটা বাঁশের লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে তারা খেপা ষাঁড় ঠাণ্ডা করে, জঙ্গলের জানোয়ার তাড়ায়।

পীতেম বলে, বাজিকর তো স্থায়ী বসবাস করে না। দু-চার মাস থাকব, ফের উঠে যাব। তোমাদের জমি তো দখল হয়ে যাচ্ছে না।

সে কথা কেউ শুনল না। তারা বাজিকরদের তিনদিনের মধ্যে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। পীতেম বলল, ঠিক আছে, যাব। সারা দুনিয়া বাজিকরের। জায়গার অভাব?

কিন্তু অন্যরা বলল, কিন্তু ভঁইস? কিন্তু ঘোড়া? খাব কি? যাব কি করে?

পীতেম ভাবতে থাকে, কিন্তু ভঁইস? কিন্তু ঘোড়া? খাব কি? যাব কি করে দেশ-দেশান্তর? শনিবারের ভূমিকম্প কিছুই অবশিষ্ট রেখে যায়নি। দলকে এখন বাঁচানোই মুশকিল।

দু-রাত্তির ঘুম হলো না পীতেমের। দৈবদুর্বিপাক তার মনটাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তৃতীয় রাতে অচেতনের মতো ঘুমায় পীতেম। ঘুমের মধ্যে তার মরা বাপ দনু আসে তার কাছে।

পীতেম হে, পীতেম?

বাপ?

চোখত্ পানি ক্যান বাপ?

পথেত্ যামো কেংকা বাপ? দল নষ্ট হোই যাবে, বাপ।

ক্যানে বাপ, তোর দুষ্কু কিসের?

ভঁইস কোই বাপ? ঘোড়া কই বাপ?

হাঁই দেখ, জঙ্গলের ধারে কত গাবতান ভৈঁসী ঘুরে বেড়ায়। হাঁই দেখ, কত জোয়ান টাট্টু ঘুরে বেড়ায়। ওলা সব তুমার। দুনিয়ার বেবাক মাঠ্যে চরা জানোয়ার তুমার।

বাপ!

পীতেম হে, পীতেম, পুবের দেশে যাও, বাপ। সিথায় তুমার নসিব।

পুবের দেশেত্?

পীতেম, হে পীতেম, রহু তুমার সহায় থাকুক।

পরদিন পীতেমের দল জঙ্গলের পথ ধরে দিগন্তের দিকে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে গেল পাঁচটি গাবতান মোষ, পাঁচটি বাছাই টাট্টু। পথে সেই মোষদের নধর বাছুর হলো। দুধের বান ডাকল। সেই দুধ-ঘি বাজিকরের মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করতে করতে চলল। সেইসব জানোয়ারের বংশ বাড়ল। বাজিকর তখন জানোয়ারও বেচত।

এইভাবে, শারিবা, গোরখপুর থিকা ডেহ্‌রিঘাট, সিথায় ক-বছর, তা-বাদে সিওয়ান, সিথায় ক-বছর, তা-বাদে দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, কত দেশে তোর নানার নানা বসত করার চেষ্টা করল, হলো না। তারপর এই পুবের দেশ। তা এখানেও কি স্বস্তি আছে? মানুষ চায়, বাউদিয়া বাউদিয়াই থাকুক, বাজিকর বাজিকরই থাকুক। তার আবার ঘর-গেরস্থালি কি? রাজমহল, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহী, আমুনাড়া, পাঁচবিবি। সব শেষে এই পাঁচবিবি। আরো কত দ্যাশ ঘুরলো সি বাজিকরের দল, তোক্ আর কি ক'মো। সব কি কারো স্মরণ আছে?

বাউদিয়া-বাজিকর পিছনে যা ফেলে যায় তা জানোয়ারের বিষ্ঠা, কে তার কথা স্মরণ করে? যা পরিত্যাজ্য তাই পিছনে ফেলে যেতে হয়। তার কথা মনে রাখার কোনো কারণ নেই। তবুও পীতেম বৃদ্ধ বয়সে নাতবউ লুবিনির কাছে এসব কথা বলত। কেননা ধন্দু জোয়ান বয়সে খুন হয়েছিল। জামিরের বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছর বয়সে, তখন লুবিনির বয়স দশ বছর। সেই দশ বছরের মেয়েকে সামলানোর দায় ছিল পীতেমের। বাজিকরের তাঁবুতে এত কম বয়সে বিয়ের রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু এই পুবের দেশে সাহেবদের তখন বড় হাঁকডাক। কীভাবে যেন রটে গিয়েছিল, মহারানির রাজত্বে ষোল বছরের ঊর্ধ্বে ছেলেমেয়েদের আর বিয়ে দেয়া যাবে না। দিলে বে-আইনি হবে। এরকম গুজব হামেশাই রটত তখন। কেউ তলিয়ে ভাবত না, ভয় পেত। কাজেই একদিন পনেরো জোড়া বাজিকরের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। তার মধ্যে জামির আর লুবিনিও ছিল।

তাই পীতেম সামলাত লুবিনিকে। পীতেম বলত শনিবারের ভূমিকম্পের কথা। পীতেম বলত ডেহ্‌রিঘাট, সিওয়ানের কথা। তারপর রাজমহলের কথা।

৩

রাজমহলের গঙ্গার ধারে বাজিকরের ছাউনি পড়ল সারি সারি। রাজমহল তখন গমগমা জায়গা। এখানে সেখানে রেলের লাইন বসছে। গঙ্গায় শ'য়ে শ'য়ে মহাজনি নৌকো। গোছগাছ হয়ে গেলে দলের লোকদের ডেকে পীতেম বলে, এ জায়গা মনে হচ্ছে পয়সার জায়গা। যে যার মতো কাজে লেগে পড়। বাপ আমাকে বলেছিল পুবের দেশে আসতে। এ হলো সেই পুবের দেশ। গোরখপুরের ঠিকানা তো উঠেছে। নতুন ঠিকানা বানাতে হবে। এখন পয়সা কামাও।

কদিনের মধ্যেই খবর পেয়ে দারোগা এসে হাজির হয়। পীতেম বলে, চৌকিদার দিয়ে খবর পাঠালেই হতো, হুজুর। কষ্ট করলেন।

দারোগা প্রতি ছাউনিতে উঁকি দিয়ে দেখল। তারপর বলে, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

পীতেম মিথ্যা কথা বলে, কেননা, এরকমই নিয়ম।

দারোগা বলে, কতদিন থাকা হবে?

পীতেমের অনির্দিষ্ট উত্তর, কেননা, এরকমই নিয়ম।

দারোগা তারপর জন্তু জানোয়ার দেখে এবং সবচেয়ে দামাল ঘোড়াটি পছন্দ করে।

পীতেম একটু বিপদে পড়ে, কারণ ঘোড়াটা ধন্দুর বড় আদরের এবং ধন্দুকেই সে সওয়ার হিসেবে সহ্য করে। সে বলে, হুজুর, ও বজ্জাতকে নিয়ে পোষাতে পারবেন না। ও হুকুম মানে না, পোষ মানে না। নিয়ে গেলেও পালিয়ে আসবে।

দারোগা এসব অজুহাত মনে করে। তাছাড়া ঘোড়াটা তার পছন্দ হয়েছে এবং ছেলের জন্য একটা তার দরকারও।

দারোগা বলে, দেখ, বাজিকর, জানোয়ারটা আমার চাই। পরে পাঠিয়ে দিও।

পীতেম তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে নানাভাবে। বলে, হুজুর, ও জানোয়ার অবাধ্য। আপনি আর চারটার মধ্যে যেটা হয় একটা বেছে নিন। না হলে পরে আমায় দোষী করবেন।

পীতেম এসব কথা বলছিল, এবং ধন্দুর দিকে নজর রাখছিল। ধন্দু গম্ভীর মুখে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

দারোগা কথা না বাড়িয়ে লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়ায় উঠে টাপটাপ শব্দে সামনে এগোয়। সঙ্গের চৌকিদার বলে, বাজিকর, ঘোড়া কাল সকালের মধ্যে

পৌঁছায় যেন, না হলে তোর কপালে দুঃখ আছে।

ধন্দু হঠাৎ লাফ দিয়ে তার আদরের ঘোড়ায় উঠে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই সে গঙ্গার বালিয়াড়িতে নেমে পড়ে সামনের দিকে ঘোড়া হাঁকাতে থাকে পাগলের মতো। পীতেম শুধু তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না। ধন্দু দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। গঙ্গার বালিয়াড়িতে ধুলো ওড়ে, তার মধ্যে ধন্দুর মাথার লাল ফেট্টির ঝলক দেখা যায় শুধু। কিন্তু পীতেম জানে ঘোড়াটা দিতে হবে।

অনেক রাত হয়ে যাওয়ার পরেও ধন্দু ঘোড়া নিয়ে ফিরল না। বাজিকরদের খোলা আকাশের নিচে রাত্রিবেলার আহার শেষ। সব তাঁবুর সামনের আগুনই প্রায় নিভে এসেছে, কিন্তু ধন্দু ফিরল না।

মাঝরাতে পীতেম আরো তিন জোয়ান বাজিকরকে ডেকে ওঠাল। ধন্দুকে খুঁজে বের করতে হবে, কাল সকালে ঘোড়াটা দারোগাকে দিয়ে আসতে হবে।

চারটি টাট্টুতে চারজন সওয়ার হয়ে গঙ্গার পলি ভাঙতে থাকে।

পীতেম বলে, আমার বাপ বলেছিল, দুনিয়ার সব মাঠে-চরা জানোয়ার তোমার।

বালি নামে এক যুবক বলে, কিন্তু তার মধ্যের ভালোটা দারোগার।

জ্যোৎস্নালোকিত বালির চড়ায় চারজন ঘোড়সওয়ার হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে স্তব্ধতা ভাঙে।

পীতেম বলে, ধন্দুটা বোকা। ভালো ঘোড়া মাঠে আরো চরবে।

চাঁদের আলোয় বাঁ পাশে রুপোর মতো চক্‌চকে গঙ্গা রেখে দু' ক্রোশ মতো পলি ভাঙে তারা। তারপর ধন্দুকে পায়। গঙ্গার দিকে পিছন দিয়ে সে বসেছিল। সামনে ঘোড়াটা দাঁড়িয়েছিল ছবির মতো।

এদের আসতে দেখে ধন্দু উঠে দাঁড়ায়। কোনো কথা না বলে নিজের ঘোড়ায় উঠে তাঁবুর দিকে চলতে শুরু করে। এরা চারজন নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে।

কিছু সময় পরে পীতম বলে, তোর নানা বলত, মাঠে যত জানোয়ার চরে তার সবই বাজিকরের।

আর ধন্দুও প্রায় বালির কথাটাই বলে। বলে, কিন্তু এটা দারোগার।

কিন্তু দারোগার মান তো রাখতেই হবে।

আজ রাতেই তো এখান থেকে চলে গেলে হয়।

পাগল!

তাহলে দারোগাকে তোমার অনেককিছু দিতে হবে, শুধু ঘোড়ায় হবে না।

পীতেম বলেছিল, এ দেশে পয়সা আছে। ভিখ্-মাঙ্গা বাজিকরের কাছ থেকে আর কি নেবে দারোগা!

পরদিন দারোগার ছেলে এসে হাজির হয়েছিল সকাল সকালই। বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা। পীতেম বলেছিল, আসুন, ছোট হুজুর, বসুন।